আহমাদ ফালুদ্দিন

প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের বয়ানে
আফগানদের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও আমেরিকার পরাজয়
[২০০১-২০২৩]

সিসাঢালা প্রাচীর

প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের বয়ানে
আফগানদের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও আমেরিকার পরাজয়
[২০০১-২০২৩]

সিসাঢালা প্রাচীর

আহমাদ ফালুদ্দিন

অনুবাদক : **মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম**

সংযোজক : **যহীরুল ইসলাম**

সম্পাদক : **আবদুল হক**

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳৩৫০, US $16, UK £13

প্রচ্ছদ : ইলিয়াস বিন মাজহার

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-98013-0-6

Shishadhala Prachir
The Stone of Earth: The Struggle of
Conquerors and Protectors in Afghanistan
by **Ahmad Faluddin**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

আমিরুল মুমিনিন মোল্লা উমর রাহ.-এর নেতৃত্বে আফগানিস্তান তখন মাত্রই কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। আর ঠিক তখনই ঘটে টুইন টাওয়ার হামলার ঘটনা। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ অক্টোবর সেই হামলার প্রতিবাদে আমেরিকা ও ন্যাটোবাহিনী হাজার বছরের ঐতিহ্যঘেরা পাহাড়-পাথর আর সাগর-নদীর উঁচু-নিচু প্রকৃতির অপরূপ ভূস্বর্গে ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে শুরু করে বিমান হামলা। এসব হামলার মুখে ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে সরে দাঁড়ায় তালেবান। কথিত সন্ত্রাস দমনের নামে মার্কিনরা নিজেরাই শুরু করে সন্ত্রাসী ও মানবতাবিবর্জিত কার্যক্রম, যাতে লাখ লাখ মানুষের জীবন হয় বিপন্ন। ক্ষতি হয় মানবসভ্যতার।

২০ বছর আগের তালেবান মুজাহিদরা তখন যুদ্ধকৌশল হিসেবে প্রতিরোধের পরিবর্তে কাবুল ছেড়ে চলে যান বন-বাদাড়ে, গহিন অরণ্যে। সেখান থেকেই তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যান সর্বতোভাবে। পরিকল্পনা করেন দীর্ঘমেয়াদি। তবে মাঝেমধ্যে চোরাগোপ্তা হামলা করে এক-দুটো মার্কিন সেনার মস্তক মল-ব্যর্জ জৈব সার হিসেবে আফগান ভূমে পুঁতে রাখতে ভুল করেননি। কখনো-বা আবার মুজাহিদদের রক্তে ইতিহাসের পাতায় ছবি আঁকা হতো পরম যতনে। এভাবেই কেটে যায় দীর্ঘ ২০টি বছর। আমু দরিয়া, কাবুল আর হেলমান্দ নদীতে বয়ে যায় কত জল-রক্ত।

২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট রবিবার। সেদিনই দীর্ঘ দুই দশকের ধ্বংসোল্লাস শেষে শূন্য পুঁটলি হাতে অপমানের বিদায় ঘটে মার্কিনদের। তালেবানরা বিনা রক্তপাতে দখলে নেয় রাজধানী কাবুল। আকস্মিক এমন জয়-পরাজয়ে বিশ্ববাসী হয়ে যায় স্তব্ধ। বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে শুধু পরাক্রমশালীদের পলায়ন; আর পাহাড়-গুহায় দিন কাটানো তালেবান মুজাহিদদের অবিশ্বাস্য বিজয়।

আল জাজিরার সিনিয়র সাংবাদিক আহমাদ ফালুদ্দিন পেশাগত দায়িত্বপালনে কাবুলের থমথমে সেই দিনগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। আমেরিকান সেনাদের পলায়নদৃশ্য, আফগান জনগণের আনন্দের হিল্লোল এবং পারিপার্শ্বিক কিছু ঘটনাচিত্র তিনি *হাজারুল*

আরজ নামে একটি গ্রন্থে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কালান্তর সেটারই বাংলায়ন করেছে *সিসাঢালা প্রাচীর* নামে।

লেখক-অনুবাদক মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন। অনুবাদে ছিল মুনশিয়ানার ছাপ। এ ছাড়া বরাবরের মতোই কালান্তরের সম্পাদনাপর্ষদ বেশ যত্নের সঙ্গে গ্রন্থটির ভাষা, বানান ও বিন্যাসে সময় দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, আহমাদ ফালুদ্দিন তাঁর গ্রন্থটিতে শুধু তালেবানের ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনাপরম্পরা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে। এরপর থেকে আফগান ইমারাতে ইসলামিয়ার দুই বছরের সোনালি দিনগুলোর বিবরণ যেহেতু ছিল না, তাই আমরা চতুর্থ ও পঞ্চম নামে আরও দুটি অধ্যায় এতে যুক্ত করেছি। দুটি অধ্যায়ই সংকলন করেছেন যহীরুল ইসলাম। তাতে চতুর্থ অধ্যায়ে শহিদ আমিরুল মুমিনিন মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মানসুরের জীবনালেখ্য; আর পঞ্চম অধ্যায়ে অক্টোবর ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত বর্তমান আফগানিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুবাদক, সংকলক, সম্পাদক সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
অক্টোবর ২, ২০২৩

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। দুরুদ ও সালাম বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি। আমার মনে হয় একটি বইয়ে অনুবাদকের কথা লেখা সেই বইটি অনুবাদ করার চেয়ে কম কঠিন কিছু নয়। কেননা, অনুবাদ করতে গিয়ে যেসব বিচিত্র সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তা কম কথায় বলে ফেলা মোটেই সহজ কাজ নয়। মূল আরবি বইটির নাম *হাজারুল আরজ*, শাব্দিক মানে 'পৃথিবীর পাথর'। কুরআনিক অনুষঙ্গ জুড়ে দিয়ে আমরা তারই বাংলা করলাম 'সিসাঢালা প্রাচীর'। *আল জাজিরার* প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক আহমাদ ফালুদ্দিন বইটিতে বিশেষভাবে মোল্লা মুহাম্মাদ উমর এবং খোরাসানিদের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর সাক্ষ্য ও অভিজ্ঞতার বয়ান তুলে ধরেছেন এবং এ থেকেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন তাঁদের অবিচলতা ও অজেয়তার গূঢ় রহস্য—যে কারণে যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদীরা এই মাটি থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। একজন পাঠক ও অনুবাদক হিসেবে এর সারকথা আমার মনে হয় ধরা রয়েছে পবিত্র কুরআনের এ চিরন্তন বাণীতে :

> এটাই আল্লাহর বিধান—প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, তুমি আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না। [সুরা ফাতহ : ২৩]

আল্লাহ তাআলা এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে দান করেছেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য—বস্তুগত ও আত্মিক। আগুনের গুণ দহন, বাতাসের বয়ে চলা—সাধারণত এর ব্যত্যয় ঘটে না। এ হলো বাহ্যিক দৃষ্টান্ত। অন্তরের দিকে, মানুষের মনোজগতেও রয়েছে দুই দিক—ইমান ও কুফর। আল্লাহ ইমানে রেখেছেন অপরাজেয় শক্তি আর কুফরকে দিয়েছেন দুর্বলতা ও লাঞ্ছনা। তাই ইমান চিরদিন বিজয়ী আর কুফর শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও লাঞ্ছিত। আল্লাহ বলেন :

> এবং বলো—'সত্য এসেছে ও মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে;' মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই। [সুরা ইসরা : ৮১]

ইমান এবং ইমানদাররাই সর্বদা বিজয়ী হবে, তাদেরকে কেউ হারাতে পারবে না—চিরসত্য এ কথাটা অন্য আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে :

> তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী, যদি

তোমরা মুমিন হও। [সুরা আলে ইমরান : ১৩৯]

হ্যাঁ, মুমিনের ইমানই তাঁর সফলতা ও জয়লাভের আসল রহস্য। স্রেফ জনবল বা বস্তুগত প্রাচুর্যে মুমিন নির্ভর করে না। ইমানদার মূলত তাকওয়ার বলেই জেতে। ইমান আর তাকওয়া যতক্ষণ মজবুত, মুমিন অপরাজেয়। এ দুয়ে ঘাটতি থাকলে বস্তুগত ক্ষমতা কোনো কাজে আসে না, আসবে না। নিম্নোক্ত আয়াতটি পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এ সত্যকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দেবে :

> আল্লাহ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে আর হুনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু এটা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল, পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। [সুরা তাওবা : ২৫]

ইতিহাসের অজানা কাল থেকে শুরু করে হালের কথিত পরাশক্তিদের লাঞ্ছনাকর বিদায় এবং খোরাসান ও খোরাসানিদের অবিচলতা ও অপরাজেয়তার রহস্যের সূত্র রয়েছে উল্লিখিত আয়াতগুলোয়।

খোরাসানিরা খোরাসানে বাস করে বলে নয়, বরং তারা আল্লাহর দেওয়া বিজয়ের শর্ত পূরণ করেছে বলেই বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছে। এ বিজয় শুধু খোরাসানিদের জন্য নয়—আমি, আপনি, আমরা যারাই শর্ত পূরণ করব, বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবে। আল্লাহ আমাদেরকে উমরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ইমানের বলে বলীয়ান হয়ে, আরও একবার ঘুরে দাঁড়ানোর তাওফিক দান করুন!

মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম
৩০ জুলাই ২০২৩
মদিনা মুনাওয়ারা

সূচিপত্র

পূর্বকথা ১৩
ভূমিকা : খোরাসানের প্রাচীর ১৫
জাতীয় উন্মাদনা ২২

প্রথম অধ্যায়

কালের আবর্তে আফগানিস্তান # ৩২

রূপসীর জন্য তার রূপই যেন অভিশাপ ৩২
আফগানিস্তান ও ইসলাম ৩৫
বিচ্ছিন্ন ভূমি ৩৭
অতীতের ছায়া ৪১
এক : হেরাত ৪১
দুই : বলখ ৪৩
তিন : কান্দাহার ৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ # ৫১

শুরুটা একজন নারীর কারণে ৫১
নববি চাদর ৫৫
পৃথিবীর প্রস্তরখণ্ড : মোল্লা উমর ৫৭
এক : ছায়ায় অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ৬১
দুই : তথাকথিত ডাক্তার ৬৭
তিন : ইস্পাতকঠিন মুমিন ৭০
চার : বিন লাদেনকে সমর্পণ ৭১
পাঁচ : গল্পের শেষ কথা ৭৫

তৃতীয় অধ্যায়

বিজয়ী পাগড়ি : তালেবানের প্রত্যাবর্তন # ৭৭

অগ্নিগর্ভ এক রাত	৭৭
নারী গোয়েন্দা	৮৭
তালেবানের টিকে থাকার রহস্য	৯৬
আখেরি থাপ্পড়	১০৪
কাবুল, ১১:৫৯ পিএম	১০৮
সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাবশেষ	১১২
ভিন্ন এক তালেবান	১১৬
লক্ষ্যে অবিচল দাড়িওয়ালা এক জাতি	১২৪
বার্নার্ড লুইস ও ইবনু খালদুন	১৩৩
শেষ কথা	১৩৯

চতুর্থ অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মানসুর # ১৪১

এক	: জন্ম ও বংশ	১৪১
দুই	: শিক্ষাদীক্ষা	১৪১
তিন	: সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান	১৪১
চার	: যুদ্ধজীবন	১৪২
পাঁচ	: সশস্ত্র লড়াই, জখম ও কারাবরণ	১৪২
ছয়	: তালেবান প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান	১৪২
সাত	: ইমারাতে ইসলামিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদে	১৪৩
আট	: বিমান ব্যবস্থাপনায় অসামান্য কীর্তি	১৪৩
নয়	: ফের কারাবরণ	১৪৪
দশ	: আমেরিকার বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই	১৪৪
এগারো	: নায়িবে আমিরুল মুমিনিন হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ	১৪৪
বারো	: মোল্লা উমরের ইনতিকালের পর	১৪৫
তেরো	: আমিরুল মুমিনিন নির্বাচিত	১৪৬
চৌদ্দ	: যোগ্য নেতৃত্ব	১৪৬
পনেরো	: মাজহাব ও মানহাজ	১৪৭
ষোলো	: প্রাত্যহিক জীবন	১৪৭
সতেরো	: শাহাদাত	১৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

তালেবান শাসনের দুই বছর # ১৪৮

এক : তালেবান যখন কাবুলে প্রবেশ করল ১৪৮
দুই : উদারতার আরেকটি নমুনা ১৪৯
তিন : তালেবানের মন্ত্রিসভা গঠন ১৫০
১. রাষ্ট্রপতি বা আমিরুল মুমিনিন : শায়খ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা ১৫০
২. প্রধানমন্ত্রী : মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান আখুন্দ ১৫৪
৩. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : সিরাজুদ্দিন হাক্কানি ১৫৪
৪. উপ-প্রধানমন্ত্রী : আবদুল গনি বারাদার ১৫৪
৫. প্রতিরক্ষামন্ত্রী : মোল্লা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ১৫৫
চার : শাসনপদ্ধতি ১৫৫
পাঁচ : গণতান্ত্রিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ১৫৬
ছয় : জোরদার নিরাপত্তাব্যবস্থা ১৫৬
সাত : নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৬২ হাজার সিসি ক্যামেরা স্থাপন ১৫৭
আট : আন্তর্জাতিক মহলের বিবৃতি ১৫৮
১. জাতিসংঘের বিবৃতি ১৫৮
২. ব্রিটিশ এমপির মুগ্ধতা ও স্বীকৃতির আহ্বান ১৫৮
নয় : জনগণের অভিব্যক্তি ১৫৯
দশ : বিচারব্যবস্থা ১৬০
এগারো : শাস্তিপ্রয়োগে সতর্কতা ও অনুসৃত নীতি ১৬০
বারো : শিক্ষাব্যবস্থা ১৬১
১. নতুন শিক্ষক নিয়োগ ১৬১
২. শিক্ষার্থীদের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে উপপ্রধানমন্ত্রী ১৬১
তেরো : নারীর সুরক্ষা বজায় রেখে শিক্ষা ১৬২
চৌদ্দ : মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা, ইমারাতে ইসলামিয়ার জবাব ১৬৩
পনেরো : পররাষ্ট্র ও কূটনীতি ১৬৩
১. যেকোনো দেশের সঙ্গে কাজ করতে সম্মত তালেবান সরকার ১৬৩
২. তুরস্কের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ ১৬৪
৩. একসঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী পাকিস্তান-রাশিয়া ১৬৪
৪. একসঙ্গে কাজ করবে তুরস্ক ও কাতার ১৬৪
৫. পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি ১৬৫
৬. পাকিস্তানে বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনার আবেদন ১৬৫
৭. আফগানিস্তানে ইরানের ফ্লাইট চালু ১৬৫
৮. প্রশংসায় পঞ্চমুখ জাপান ১৬৬

৯. সুইডেনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ ১৬৬
১০. আফগানিস্তানে চীনের নতুন রাষ্ট্রদূত ১৬৭
ষোলো : অর্থনীতি ১৬৮
১. তালেবান সরকারের অর্থনীতি ১৬৮
২. রাজস্ব সংগ্রহ ও রপ্তানি বৃদ্ধি ১৬৮
৩. দস্যু আমেরিকা আটকে রাখে আফগানিস্তানের সম্পদ ১৬৯
৪. জ্বালানি তেলসহ খাদ্যপণ্যের দামে স্থিতিশীলতা ১৬৯
৫. আফগানি মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধির কারণ ১৬৯
সতেরো: শিল্প ও বাণিজ্য ১৭১
১. খনি বাণিজ্য ১৭১
২. পাঁচ মাসে ৮০০ টন পাইন বাদাম রপ্তানি ১৭৩
৩. আঙুর ও ডুমুর রপ্তানি ১৭৩
৪. বছরে ৪০ হাজার মেট্রিক টন তুলা উৎপাদন ১৭৩
৫. রপ্তানি বৃদ্ধি ১৭৩
৬. আফগানি মুদ্রার অবস্থান ১৭৪
আঠারো: যোগাযোগব্যবস্থা ১৭৬
১. মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প ১৭৬
২. সালাং মহাসড়ক ও টানেল উদ্বোধন ১৭৭
৩. ট্রান্স আফগান রেলওয়ে প্রজেক্ট ১৭৭
উনিশ : উন্নয়ন প্রতিদিন ১৭৭
১. ৩০ লাখ মানুষের জন্য নির্মিত হচ্ছে নিউ কাবুল সিটি ১৭৭
২. নারী ও শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ১৭৮
৩. অসহায় ও বিধবাদের জন্য ভাতা ১৭৯
বিশ : অন্যান্য উন্নয়ন ১৭৯
১. নারীদের জন্য পৃথক শপিং মল ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন ১৭৯
২. পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ১৭৯
তথ্যসূত্র ১৮২

পূর্বকথা

২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৯-এর অপরাহ্নে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে যখন সোভিয়েত ট্যাংকগুলো গোলাবর্ষণ শুরু করে, লেখক তখন কোলের শিশু। ওই মুহূর্ত থেকেই আফগানিস্তান স্থায়ী যুদ্ধক্ষেত্র আর সাম্রাজ্যবাদীদের খেলার মাঠে পরিণত হয়েছে। ১৯১৯ সালে ইংরেজদের থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে রুশ বাহিনীর অভিযানের মধ্যবর্তী সময় ছাড়া আধুনিক আফগানিস্তান কখনো স্থির হতে পারেনি।

আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করায় আফগানদের এ লড়াই আরও রক্তক্ষয়ী হয়ে ওঠে। ২০০১ সালের ৭ ডিসেম্বর বিকালে মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো হিন্দুকুশ পর্বতমালা পার হয়ে আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ শুরু করলে দেশটি আরেক দফায় সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে।

আমি যখন আফগানিস্তান সফরের জন্য ব্যাগ গোছাচ্ছি, তখন আমার মাথায় এসব ছবিই ঘুরছিল। আল *জাজিরা* চ্যানেলের প্রতিনিধি হিসেবে আমি আফগানিস্তান যাচ্ছি, আফগানিস্তান থেকে মার্কিনদের বিদায় আর রাজধানীতে তালেবানের প্রত্যাগমন বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য। আমার মনে হচ্ছিল, দীর্ঘজীবন সাংবাদিকতার পরে এবারই প্রথম এমনকিছু লিখতে যাচ্ছি, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাবে না। আফগানিস্তানের প্রতিটি গ্রাম ও লোকালয় আমি চষে বেড়িয়েছি এবং ভেতরে ভেতরে চরম উত্তেজনা বোধ করেছি—সভ্যতার সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে ঋদ্ধ এবং প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ কোনো অঞ্চলে যেকোনো ঐতিহাসিক বা ইতিহাসলগ্ন ব্যক্তিই পদে পদে এমন উত্তেজনা অনুভব করবেন। আফগানিস্তান ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন নব্য কোনো জনপদ নয়—প্রাচীনকাল থেকেই ক্রমাগত উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় এবং মানবতা-শয়তানির নির্বিরাম দ্বন্দ্বের নাট্যমঞ্চ এই জনপদ। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ও চেঙ্গিস খানের বিশাল বাহিনী থেকে শুরু করে সভ্যতার সকল শত্রু-মিত্রের আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল আফগানিস্তান। চিরকালই এ ভূমি দখলদার, বণিক, যোদ্ধা, কবি, ওলি ও আবিদদের পদচারণায় ছিল উন্মুখর।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা বরাবরই এই দেশের ভূ-সন্তানদের কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়েছে। সাহস, শৌর্য আর দৃঢ়তায় একেকজন আফগান হিন্দুকুশ পর্বতমালার একেকটি চূড়োর

মতোই শক্ত ও অবিচল। আফগানরা দীর্ঘকাল ধরে এ প্রমাণ দিয়ে এসেছে যে, তারা আব্বাসি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার সেই বক্তব্যেরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, যাতে তিনি তাঁর সেনাপতি আবু মুসলিম খোরাসানির পরিচয় দিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—'সে তো পৃথিবীর প্রস্তরখণ্ড'। ঐতিহাসিক এ উক্তিটি দৃঢ় মনোবল, অদম্য সাহস আর পাহাড়সম অবিচলতাকে সার্থকভাবে প্রকটিত করেছে।

এই বিরাট পটের ওপর আসল আফগানিস্তানের জীবন্ত একটি ছবি আঁকার ইচ্ছাই আমাকে এ বইটি লিখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। এতে আমি সাংবাদিকের গৎবাঁধা ভূমিকা পালন করতে চাইনি—যে হরহামেশা রোজকার শুকনো সংবাদগুলোই এমনভাবে আওড়ে যেতে থাকে যে, ঘটনাপ্রবাহের ঐতিহাসিক শিকড় এবং সভ্যতার তাৎপর্যের সঙ্গে তার প্রতিবেদনের কোনো যোগ থাকে না। কিন্তু আমি এখানে অতীতের বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটের ওপর সহসা বাঁক-নেওয়া বর্তমানকে রেখে আবহমান আফগানিস্তানের একটি নিখুঁত ছবি ও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে চেয়েছি, যা পাঠককে একটি স্থির দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করতে পারে। সে জন্যই যথাসম্ভব দ্রুত বইটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কৃতজ্ঞতা আমার বন্ধুদের প্রতি—মুহাম্মাদ আল মুখতার ইবনু আহমাদ (আবু নাজ্জার), মুহাম্মাদ আল মুখতার আশ-শানকিতি, আসলাম ফারুক ও আবদুল কুদ্দুস আল হাশিমি—যাঁরা ব্যস্ততা সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপিটি দেখে দিয়েছেন।

আহমাদ ফালুদ্দিন
দোহা, রবিউল আওয়াল ২৯, ১৪৪৩
নভেম্বর ৪, ২০২১

ভূমিকা

খোরাসানের প্রাচীর

নিঃসন্দেহে কৌশলগত দিক থেকে আফগানযুদ্ধ ছিল ভয়ংকরভাবে ব্যর্থ।

—মার্ক মিলি, চেয়ারম্যান, জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ, ইউএসএ।

বিমানের চাকা কাবুলের মাটি স্পর্শ করল। মাথায় তখন ঘুরছিল—যেন আমি মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজে নেমেছি, লোকেরা পালাচ্ছে আর আমরা ভেতরে ঢুকছি। বিমানবন্দরটি সামরিক এলাকায়, সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিরাপত্তার খাতিরে বিমানবন্দরের ভেতরেই যেন আমাদের থেকে যাওয়া উচিত, এমনই পরিস্থিতি। ক্যাপ্টেন মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বেরোনোর পদ্ধতি ও সতর্কতার ব্যাপারে বলতে শুরু করল। কিন্তু দোহা থেকে আমাদেরকে কাবুলে নিয়ে আসা বিমানটির বিকট আওয়াজে আমাদের কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। পেছনের দরজা খোলা হলো। বাইরে তাকাতেই দেখলাম, কাবুলের আলো শহরবেষ্টিত পাহাড়গুলোর শিখরে ঝলমল করছে।

বেরিয়ে এলাম আমরা। প্রথমবারের মতো পা রাখলাম কাবুলের মাটিতে। শীতল প্রাকৃতিক বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল গায়ে। কয়েক ঘণ্টা আগেই দোহায় যেমন ছিলাম, এখানকার আবহাওয়া তার মতো উত্তপ্ত নয়। ঝিরিঝিরি বাতাসে প্রকৃতি এখানে চঞ্চল। হাজার হাজার মার্কিন ও অন্যান্য সেনা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে। ওদিকে আফগান নারী, পুরুষ ও শিশুদের দীর্ঘ সর্পিল সারি। তারা এগিয়ে চলেছে—ঠেসাঠেসি করে, একে-অন্যের সঙ্গে লেপটে গিয়ে। প্রথমেই যা দেখে আমি ধাক্কা খাই তা হলো, কারও মুখেই কোভিড-মাস্ক দেখা যাচ্ছে না। মাস্ক এখানে যেন বিলাসিতা, কেবলই শখের কিছু। যারা নিত্যদিন জঙ্গি বিমানের বিকট আওয়াজ আর মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের শব্দের মধ্যে দিনাতিপাত করে, তাদের কাছে করোনা নিয়ে উদ্‌বেগ বাহুল্য বা বিলাসিতাই বটে।

ছাউনি ফেলে গোটা বিমানবন্দরকে যেন সেনানিবাসে পরিণত করা হয়েছে। কাছেই দাঁড়ানো একজন সেনাকে দেখতে পেলাম। মোটা উর্দিপরা, ভারী অস্ত্রে সজ্জিত। হাতে ঝুলছে রাইফেল। শরীরের সামান্য অংশই দেখা যায়। আমরা ওদের সতর্কদৃষ্টির মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিলাম। কঠিন নিরাপত্তা আর বাড়াবাড়ি রকমের সতর্কতা দেখে মনে হয়, যেন আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই কারও জন্য বিপদ ডেকে আনছে। এই বুঝি আমাদের দিকে তাক করা হলো ভয়ংকর কোনো অস্ত্রের নল। হঠাৎ চার বছর আগের স্মৃতি মনে পড়ল আমার। অক্টোবর, ২০১৭। এখানেই, হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেছিলাম। শত শত সাধারণ যাত্রীর সঙ্গে ইমিগ্রেশন শেষ করেছিলাম। আজকের এসবের কোনোকিছুই সেদিন ছিল না।

বিমানবন্দরের উঁচু দেয়াল ঘেঁষে আমরা এগোচ্ছি বেরোনোর গেইটের দিকে। হঠাৎ এক মার্কিন সেনা ধমকের সুরে বলল—'কোথায় যেতে চাচ্ছেন?' হয়তো আশ্চর্য হচ্ছিল সে। বাইরে থেকে হাজারো আফগান নরনারী যেখানে পড়িমরি করে ভেতরে ঢুকছে, সেখানে আমরা কিনা বেরোতে চাচ্ছি! জানালাম—'বেরোতে চাই, আমরা সাংবাদিক।' সেনাটি আমাদের একজনকে বলল—'আগে ভাবতাম শুধু সেনারাই বোধহয় পাগল হয়, এখন তো দেখি সাংবাদিকরা আমাদের চেয়েও বড় পাগল!'

তার কথায় আমি একটু কষ্ট পেলাম। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ল খোরাসান নিয়ে লেখা আব্বাস ইবনু আহনাফের পঙ্‌ক্তিগুলো। অথচ এদের দেখে মনে হচ্ছে, এখানে যারা আসবে তাদের আর নিস্তার নেই। সে জন্যই লোকেরা কাবুল ছাড়তে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ইবনু আহনাফের খোরাসান[১] সফরের পঙ্‌ক্তিগুলো বিড়বিড় বিড়বিড় করে আওড়াতে আওড়াতে এগোতে থাকি, চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেনাসদস্যদের পাশ কাটিয়ে :

ওরা বলে, আমাদের গন্তব্য খোরাসান,
আরোহণ পাহাড়ে পাহাড়ে—
হ্যাঁ, আমরা খোরাসানে এসেছি।
আল্লাহর কী ফায়সালা, দিজলাবাসী মিশে যাচ্ছে জায়হানাবাসীর সঙ্গে
এখানে এই নির্জন প্রান্তরে।
কালের দুর্বিপাক ঘিরে আছে আমাদের,
কোথাও কোনো পথ নেই আর।[২]

---

[১] ইতিহাসে আপার খোরাসান বলতে যা বোঝানো হয়, তা বর্তমানের আফগানিস্তান, তুর্কিমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান ও ইরানের পূর্বাঞ্চলত্রয়ের সমষ্টি।

[২] আল-আগানি, আবুল ফারাজ ইসফাহানি : ৮/৩৮৮।

মূল ফটকের সামনে খাটোমতো এক মার্কিন সেনা দাঁড়িয়ে। সুঠামদেহী। কিন্তু দেখেই বোঝা যায়, অস্ত্রের ভারে বিষম ক্লান্ত সে। হাতে খাকি একটি রেজিস্ট্রার। সেদিকে চোখ রেখেই কথা বলছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী করছে সে। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে কোন সে ঐশীবাণী পাঠ করে আত্মিক প্রশান্তি খুঁজছে! কয়েক মিনিট পরে একজন বেসামরিক লোক ঢুকল। হাত বাড়িয়ে প্রবেশকারীদের গুনে গুনে রেজিস্ট্রারে ওঠাচ্ছে। যারা তাকে অতিক্রম করে বিমানবন্দরের ভেতরে ঢুকতে পারছিল, দেখে মনে হচ্ছিল যেন একেকজন পুনর্জন্ম লাভ করছে। এমন এক শহর থেকে যেন মুক্তি পাচ্ছে তারা যেখানে এরপর আর কোনো শাসন-শৃঙ্খলা থাকবে না, চলবে শুধুই বুলেট। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হাঁফ ছেড়ে বেঁচে উঠছিল একেকজন, যারা কোনো রকমে সীমাহীন অপেক্ষার এক সারি থেকে পালিয়ে বেঁচেছে, যাদের গত কয়েকদিন কেটেছে মানবস্তূপের মধ্যে। কিন্তু এরা ওই সেনাদের কাছে একেকটি সংখ্যামাত্র, যাদেরকে তালিকাভুক্ত করছে তারা—এর বেশি কিছু নয়।

আমরা যখন লোকটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সাবধান করে দিয়ে বলল সে : 'বাইরের পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক!'

আরও দু-পা এগোতেই আরেক সেনা চিৎকার দিয়ে উঠল :

'তোমরা কি আসলেই বেরোতে চাচ্ছ?'

আমরা তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা ফটকের দিকে এগিয়ে গেলাম। এবার দেখতে পেলাম আসল পরিস্থিতি। হাজার হাজার বনি আদম ফটকের বাইরে অনবরত ঠেলাঠেলি করে চলেছে ভেতরে ঢোকার জন্য। আর আমরা সেদিকেই বেরোতে এসেছি। এরা সবাই ভয় ও আশা নিয়ে মুক্তির পথের সন্ধানে নেমেছে। বেকার কিছু যুবকের সামনে এটিই সুযোগ, পলায়নের এমন সুযোগ বারবার ফিরে আসে না। এদের অনেকেই একসময় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। নেতারা তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। এমন ভূমিতে অসহায় করে রেখে গেছে, যার প্রতিটি ইঞ্চি এখন তালেবানের নিয়ন্ত্রণে। মানবপাহাড় ঠেলে কোনোমতে বেরোলাম। মানুষের গাদাগাদি আর টানা অবস্থানের কারণে চারপাশ নোংরা ও দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে।

আমাদের কেউ একজন বলল, এ গন্ধ আমাকে মিনা ও মুজদালিফার রাতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে! তার কথায় আমি কষ্ট পেলাম। সুযোগ হলে আমাদের মিনার অতীত তুলে ধরতাম। বস্তুত মিনার রাতগুলো ছিল সৌন্দর্য ও সুঘ্রাণের। কবিরা ওই রাতগুলোর কী সুন্দর বর্ণনাই না দিয়েছেন! বিশেষত ইবনু আবি রাবিআর কবিতা তার জ্বলজ্বলে উদাহরণ। সেখানকার সুগন্ধির কথা বর্ণনা করে নামিরি সাকাফি বলছেন :

নামান উপত্যকা সুঘ্রাণ ছড়ায় বাতাসে, যখন জায়নাব সুবাসিত নারীদের সঙ্গে চলে।

মিনার মুহাসসাব অঞ্চলে তারা পরস্পর হাদিয়া আদান-প্রদান করে; এলোমেলো কিছু নেই, ধুলোবালি নেই।

পরিস্থিতির কারণে আমি চুপ রইলাম। কাবুলের আল জাজিরা অফিসের কর্মকর্তা হামিদুল্লাহ শাহের সঙ্গে আমাদের একজন যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, যেন আমাদের নিতে আসে। কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হলো সে। আমেরিকানরা ইচ্ছে করেই যোগাযোগব্যবস্থার এমন হাল করে রেখেছে। অনেক চেষ্টার পর ব্যাগগুলো ফটকের বাইরে ফেলতে পারলাম, আর আমরা ভেতরেই অপেক্ষা করতে থাকলাম।

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্তি বোধ করছিলাম। দেয়ালের কাছে গেলাম হেলান দিতে। নিচের দিকে আমার পায়ের কাছে শুয়ে থাকা এক মার্কিন সেনা চেঁচিয়ে উঠল। চোখ ফিরিয়ে দেখি প্রত্যেক কোনায় কোনায় ক্লান্তশ্রান্ত সাহেবজাদারা এভাবেই ঘুমিয়ে আছে। তাদের এ পরিস্থিতি দেখে আমার মাথায় কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল—সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা তার সেনাদের এখানে ফেলে যাওয়ার পর কখনো কি এমন পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছিল? গত ২০ বছরেও কি একটি সুশৃঙ্খল প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা গেল না? তাহলে কি আমেরিকাকে হঠাৎ ফিরে যেতে হচ্ছে, যার প্রস্তুতি চলছিল অনেক আগে থেকেই? নাকি এটি আফগানদের দৃঢ়তা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দম্ভ চূর্ণ করে দেওয়ার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা?

আমি ঘুমন্ত সেনাটির থেকে একটু দূরে সরছিলাম আর ভাবছিলাম, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এ মাটির আচরণ কেমন ছিল। আমার সামনে কাবুলের সুউচ্চ পর্বতমালা স্পষ্ট ভেসে উঠল, যেগুলো আফগান জাতির চির অপরাজেয়তাকেই নির্দেশ করে। এখানে কোনো সাম্রাজ্যবাদী এসে কি নিরাপদে ফিরতে পেরেছে? নাকি আফগানরা প্রতিবারই দখলদার বহিরাগতদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করেছে ওদের তাবেদারদের? জামালুদ্দিন আফগানির (১৮৩৮—১৮৯৭) ভাষায়—'আফগানরা যুদ্ধবাজ এক জাতি, বহিরাগত কারও সামনে তারা মাথা নত করে না।'[৩]

ইতিহাসের পাতাগুলো আমার স্মৃতির দর্পণে একে একে ভেসে উঠতে লাগল। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ বাহিনীকে এখান থেকে নির্মূল করা হয়। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশদের আফগানিস্তান ছাড়তে বাধ্য করা হয়। সর্বশেষ ১৯৮৯-এ সোভিয়েত ইউনিয়নকেও

[৩] *তাতিম্মাতুল বায়ান ফি তারিখিল আফগান*, জামালুদ্দিন আফগানি : ১৫।

বিতাড়িত করা হয়।

হঠাৎ আফগান এক যুবক ফটকের ভেতরে প্রবেশ করায় আমার চিন্তায় ছেদ ঘটে। হাত দুটো উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দায়িত্বরত সেনাসদস্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চেক করার পর ভেতরে যাওয়ার ইশারা করে। সামনেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তির দূত বিমানটি দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দে যুবকের চেহারা যেন আটখানা। বিমানবন্দরের আশেপাশে মানবস্তূপের প্রতিটি হৃদয়ই এ মুহূর্তের অপেক্ষায়। সেনাসদস্য তাকে ভেতরে যেতে বলছে, কিন্তু যুবক সরছে না। সে কর্তব্যরত সেনাসদস্যের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে। তাকে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। এবার সেনাসদস্য নিজের দুই হাত প্রসারিত করল—একটি বিমানবন্দরের ভেতরের দিকে আরেকটি বনি আদমের জটলার দিকে এবং চিৎকার করে বলতে লাগল,

—অপশন দুটি : স্বাধীনতা চাইলে ভেতরে প্রবেশ করো, আর আফগানিস্তান চাইলে ফিরে যাও।

আমি তাদের এতটা কাছাকাছি হলাম যে, তাদের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। আফগান যুবক অনুনয় করে বলছিল,

—আমার পরিবারকে সুযোগ দিন! তাদের আমার সঙ্গে আসতে দিন!

সেনাসদস্য এবার আরও জোর আওয়াজে স্বাধীনতা শব্দটি ফারসিতে রূপান্তরিত করে আগের কথা পুনরাবৃত্তি করল,

—যদি 'আজাদি' চাও তাহলে ভেতরে যাও। অন্যথায় আফগানিস্তানে ফিরে যাও। তোমার পরিবারকে কোনো সুযোগ দিতে পারছি না!

তাদের মধ্যে তখনো কথোপকথন চলছিল। দেয়ালের পাশ থেকে এক পিঙ্গলবর্ণের সেনা চেঁচিয়ে বলল,

—ক্রিস! তার পাছায় একটা লাথি দিয়ে যেখান থেকে এসেছে সেখানে পাঠিয়ে দাও!

যুবকটি অনুনয় করে যাচ্ছিল আর সেনাসদস্যটি সেদিকে কর্ণপাত না করেই তাকে বনি আদমের দলে ঠেলে দিলো। আমার দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছিল। শেষ পর্যন্ত বাইরে রাখা তালেবানের একটি গাড়ি অতিক্রম করে সে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। তালেবান সদস্যরা ফটকের সামনে থেকে মানুষের ভিড় কমানোর চেষ্টা করছিল, যার ওপাশেই মার্কিন সেনারা অবস্থান করছে। আমার সামনে নতুন এক আফগানিস্তানের চিত্র ভেসে উঠল। অস্ত্রসজ্জিত তালেবান সদস্যরা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মার্কিন সেনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লোকদের বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে সহযোগিতা করছে!

কেউ কি এমন চিত্র কল্পনা করতে পারত যে, অস্ত্রসজ্জিত তালেবান মুজাহিদের আঙুল ট্রিগারের ওপর এবং একইসঙ্গে মার্কিন সেনাও তার কাছে দাঁড়িয়ে, অথচ মুজাহিদের বন্দুক গর্জে উঠবে না? তারা পরস্পরে কথা বলছে। একসঙ্গে মিলে লোকদের বিন্যস্ত করছে। এটিই কি তাহলে নতুন আফগানিস্তান? পরক্ষণেই মনে হলো, অসম্ভব কিছু নয়। আলজেরিয়া থেকে জিম্বাবুয়ে, সবখানেই ঔপনিবেশিকদের বিদায়লগ্নে বিজেতারা তাদের সঙ্গে করমর্দন করেছে। কোনো এক দলকে নির্বাসিত করার মাধ্যমেই দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

তালেবানরা ছিল আফগান যুবক। তাদের পোশাকও ছিল আফগানদের মতোই। আফগান সাধারণ জনগণ আর তাদের মধ্যকার একমাত্র পার্থক্য ছিল মেশিনগান। পোশাক আর দাড়ি তো আফগানদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। তাদের আচরণ মার্কিন সেনাদের থেকে আলাদা ছিল। আমেরিকানরা চ্যাঁচামেচি করছিল এবং হাত দিয়ে লোকদেরকে সতর্ক করছিল। আর তালেবানরা বন্দুকের গোড়ালি দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করছিল এবং ভয় দেখাতে মাঝেমধ্যে সেগুলো লাঠির মতো উঁচিয়ে ধরছিল। কিন্তু তাদের চেহারা ছিল হাস্যোজ্জ্বল এবং তারা কথা বলছিল সাধারণ মানুষের মতোই। অন্যদিকে মার্কিনদের চেহারা ছিল মলিন। বন্দুকের আড়ালে তারা নিজেদের চেহারা লুকাচ্ছিল। এই ভূমি ও ভূপতিদের অজানা ভয়ে তারা ছিল আড়ষ্ট। দীর্ঘক্ষণ ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। এত সময় আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেনাসদস্যটিকে চিন্তিত মনে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কিছু একটা করতে এগিয়ে এল। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসকে ইশারা করল,

—আমার মতে তোমরা ওই বাসের ড্রাইভারের সঙ্গে যেতে পারো, তোমাদের ব্যাগগুলো বাসে রেখে ভেতরে বসে যাও। তালেবান জওয়ানরা তোমাদের বেরোতে সহযোগিতা করবে।

ব্যাপারটা আমাদের মনে ধরল। কয়েক মিনিট পর আমরা বাসের ভেতরে গিয়ে বসলাম। গোল বাঁধল, যখনই বাসটি বেরোতে চেষ্টা করে, লোকজন ঠেলে সেটিকে আরও পিছিয়ে দেয়। আমি জানালার পাশে বসেছিলাম ভিড়ের মানুষগুলোকে খুব ভালো করে দেখব বলে। জানালার পাশেই দেখলাম একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। কোলে দুধের শিশু। সঙ্গে একজন পুরুষও আছে। ছবি তোলার জন্য আমার ফোন বের করলাম। মহিলাটি ইশারায় ছবি তুলতে নিষেধ করল। ফোন বন্ধ করে আবার পকেটে রেখে দিলাম। ঐতিহাসিক কয়েকটি মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করা আর হলো না।

ড্রাইভার বারবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। বাসের চারদিক থেকে শুধু ঘড়ঘড় আওয়াজ

হচ্ছিল। নড়ার মতো এক হাত জায়গাও পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রায় আধা ঘণ্টা পরে তালেবান জওয়ানরা আমাদের জন্য রাস্তা ফাঁকা করে দিতে চেষ্টা করে। অনেক কষ্টে রাস্তা কিছুটা খালি হয় এবং ভিড় কেটে কেটে আমাদের বাস চলতে শুরু করে।

জনসমুদ্রে সাঁতার কেটে শেষ পর্যন্ত আমরা রক্ষা পেলাম। বেরোতে বেরোতে ফজর হয়ে গেছে। অথচ আমরা বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিলাম সন্ধ্যারাতে, কাবুলের স্থানীয় সময় রাত ৮টায়। তারপর যখন বিমানবন্দর ছেড়ে কাবুল প্রবেশ করছি তখন রাতের আঁধার বিদায় নিচ্ছে, যেভাবে বিদায় নিচ্ছে আমেরিকার ২০ বছরের আগ্রাসন। তাকিয়ে দেখি চেকপোস্টে তালেবান জওয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখে মৃদু হাসি আর কাঁধে মার্কিন অস্ত্র শোভা পাচ্ছে। পেছনে বিমানবন্দরের দেয়ালের ওপাশ থেকে মার্কিন সেনাদের হেলমেটের ছায়া দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আসা আলোর ছটা যেন তাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিল।

আফগানিস্তানের এ রুক্ষ ভূমিতে ২০ বছর চক্কর খাওয়ার পর মার্কিন সেনারা নিজেদের আখের গুছিয়ে অন্তিম সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরা আজ থেকে ২০ বছর আগে তালেবানকে শেষ করতে এখানে পা রেখেছিল। আজ বিতাড়িত হওয়ার আগ মুহূর্তে সেই তালেবানের হাতেই আফগানিস্তানের চাবি তুলে দিয়ে যাচ্ছে। কাবুলে প্রবেশ করছিলাম আর আমার মাথায় একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল—কীভাবে ঘটলো এ সবকিছু?